W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 109 /WBHRC/SMC/2017

Date: 15. 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Pratidin' a Bengali daily dated 15.03.2017, captioned '২০০ টাকা দিলেই মিলবে সহায়তা'

(1) Superintendent, Nil Ratan Sarkar Medical College & Hospital, (2) Superintendent, R.G.Kar Medical College & Hospital, (3) Superintendent, S.S.K.M. Hospital, (4) Superintendent, Kolkata Medical College & Hospital, (5) Superintendent, National Medical College & Hospital, (6) Superintendent, Medical College & Hospital are directed to send their response regarding the captioned news by 18th April. 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl: News Item Dt. 15.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

অবারিত দ্বার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের সাহায্যেও অনিয়ম বহু, হাসপাতাল দাপাচ্ছে বহিরাগতরা

২০০ টাকা দিলেই মিলবে সহায়তা

নব্যেন্দু হাজরা

"দাদা আপনাদের ভাবতে হবে না। আমরা আছি তো। নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যান। শুধু যাওয়ার আগে দুশো টাকা দিয়ে যাবেন।"

গত শনিবার রাতে এনআরএস হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে কর্তব্যরত এক যুবকের মুখ থেকে এ হেন আশ্বাসবাণী শুনে বাড়ি ফিরেছিলেন বৈদ্যবাটির শ্যামল কর্মকার। কিন্তু পরদিন এসে জানতে পারলেন, মাঝরাতে তাঁর সন্তোরার্ধ্ব বাবা বাথরুমে যাওয়ার জন্য আধ ঘণ্টা ধরে চিৎকার করেও কাছে পাননি কাউকে। বাধ্য হয়ে উঠতে না পেরে বেডেই প্রস্রাব করে।

কেন এমন হাল? দু'শো টাকা নেওয়া সেই যুবকের জবাব, "দু'দিক মিলিয়ে একসাথে ৮০টা পেশেন্ট। আমরা তিনজন দেখি। কত খেয়াল রাখব!" সিস্টারদের দাবি, ওষুধ খাওয়ানো থেকে ইঞ্জেকশন দেওয়া সবই তাঁদের করতে হচ্ছে। এগুলো দেখা তাঁদের কাজ নয়। তাহলে করবে কারা?

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে কেন দিশাহীন। "যেমন চলছে, তেমনই চলবে।" দাবি এক আধিকারিকের। রোগীর আত্মীয়দের দাবি, রোগী সহায়তার নাম করে প্রতি সরকারি হাসপাতালেই ঘুরে বেড়াচ্ছে দুশো নেওয়া' এই সব ছেলেরা। রোগী ভর্তি থেকে দেখভাল, সবটাই ভাবে 'সামলাচ্ছে' তারা।

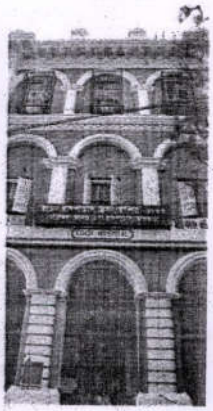

এই সেই ইডেন ভবন। যেখান থেকে শিশু চুরির অভিযোগে দিনভর উত্তাল হল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

এনআরএস, আরজিকর, এসএসকেএম, কলকাতা মেডিক্যাল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল-সহ শহরের সবা বড় সরকারি হাসপাতালেরই এক চিত্র। পরিষেবার নামে টাকা তুললেও রোগী দেখার বিন্দুমাত্র সময় নেই। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, হাসপাতাল থেকে অ্যাটেনড্যান্ট রাখা প্রথা উঠে যাওয়ার পর রোগী দেখভালের দায়িত্বে এই যুবকরাই। কিন্তু তাদের পরিচয় কী? হাসপাতালের কর্মী ওরা?

কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে "না। এখানে করেকম্মে খায়।" বেশিরভাগেরই হাতে দামী মোবাইল, খান কতক আংটিও। হাসপাতালের তারাই যেন শেষ কথা। নামে স্থানীয় বেকার যুবক। কিন্তু হাসপাতালের ভাল-মন্দে তাঁরাই সর্বেসর্বা। চিকিৎসকদের একাংশের দাবি, এই সমস্ত বহিরাগতদের হাত ধরেই ওয়ার্ডের অন্দরে ঢুকে পড়ছে বেনো জল। ঘটছে শিশুচুরির মতো ঘটনাও।

প্রয়োজনের তুলনায় প্রতি হাসপাতালেই গ্রুপ ডি এবং রোগী দেখভালের জন্য থাকা কর্মীর সংখ্যা খুবই কম। তাই বাধ্য হয়েই রোগীর আত্মীয়দের নির্ভর করতে হয় এই সমস্ত বহিরাগতদের উপর। ২০১৩ সালে কিছু ওয়ার্ডবয় নিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের ৯৫ শতাংশই চাকরি ছেড়ে দেন। সেই শেষ। আর হয়নি। তার পর থেকে এই যুবকরাই মূলত হাসপাতালের ওয়ার্ডে থাকা রোগীদের দেখভাল করেন। রোগীদের স্নান করানো থেকে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া, চা এনে দেওয়া-ইত্যাদি প্রয়োজনে স্যালাইন শেষ হলে বা অক্সিজেন দেওয়ার প্রয়োজন হলে তাঁরাই ভরসা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রোগীকে নিয়ে যাওয়াও এদের হাতে।ফলে নিরাপত্তার দায়িত্বও তাঁদের উপরই বর্তায়।

কোন বিভাগের বেডের কে দেখভাল করবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে হাসপাতালে ক্ষমতায় থাকা ইউনিয়ন। হাসপাতালে কাজ করা না করা ইউনিয়নের সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে। ওই সমস্ত বহিরাগতদের দাবি, রোগীর থেকে যে টাকা পাই, তার অর্ধেকটাই তো বেড়িয়ে যায় উপরতলায় দিতে। নিজের আর থাকে কী? মঙ্গলবার মেডিক্যাল কলেজে দাঁড়িয়ে তাই রোগীর এক পরিজন বলেই ফেললেন, "লোকে ব্যাধি নিয়ে হাসপাতালে আসেন। কিন্তু হাসপাতালেই যে কতরকমের ব্যাধি তা এলে বোঝা যায়। এ ব্যাধি সারাবে কে? তবু আগের চেয়ে কিছুটা ভাল হয়েছে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা।"

পেটের সমস্যা নিয়ে এসএসকেএমে এসেছেন বাঁকুড়ার বাসিন্দা বিতান বটব্যাল। তাঁর জামাইবাবু বললেন, রোগী সহায়তা কেন্দ্রে গিয়েছিলাম প্রথমে। সেখান থেকেই এক যুবক আমাদের ধরলেন। বললেন, হাজার পাঁচেক লাগবে ভর্তি করতে। তাঁর কথায়, ভর্তিও হয়ে গেল। এখন রোজ রাতে ২০০ টাকা করে নেয় দেখাশোনার জন্য। যদিও বেডে শোয়া শ্যালকের আক্ষেপ, "কিছু দরকার হলে একবার ওরা ফিরেও তাকায় না। অথচ টাকা গুনতে হয়।" সরকারি হাসপাতালে এই বহিরাগতরাই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কর্তৃপক্ষের। কিছু হলে তাদের কিছু বলার নেই। কারণ তারা কথায় কথায় কর্মবিরতিতে যাওয়ার হুমকি দেয়। সেক্ষেত্রে পরিষেবাই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা।

■ গত ৩৫ বছরেও সেভাবে ওয়ার্ড বয় নিয়োগ হয়নি কোনও হাসপাতালে। ২০১৩ সালে কিছু নিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের ৯৫ শতাংশই চাকরি ছেড়ে দেন।

■ ৬০০ বেডের হাসপাতালেও মাসে অ্যাটেনড্যান্টদের মধ্যে প্রায় সাত থেকে আট লাখ টাকার ব্যবসা হয়। অথচ ২০০৯ সালে অ্যাটেনড্যান্ট প্রথা তুলে দেয় সরকার। বেড বিক্রি থেকে দালালি-সহ একাধিক অভিযোগ উঠছিল তাঁদের বিরুদ্ধে।

■ কতগুলি বেডে কে ডিউটি করবে, তা নিয়ন্ত্রিত করে হাসপাতালে থাকা ইউনিয়ন।

■ রোগী সহায়তায় কাজ করেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরাও। তাঁদের হাত ধরেও প্রচুর অনিয়ম হয়। যে কেউ ঢুকে পড়ে হাসপাতালে।